Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 30-36
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

নদীয়ার লোকশিল্প

সুকন্যা পাল

ভূমিকাঃ লোকশিল্প যে কোন দেশের লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান সম্পদ। কেননা লোকশিল্প কলা যে কোন দেশ ও জাতির পরিচয়বাহী। বাংলার লোকশিল্প অতি প্রাচীন ঐতিহ্য মন্ডিত। ভারতীয় লোকশিল্পের ঐতিহ্যে পশ্চিমবঙ্গ বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় লোকশিল্পের ভান্ডার রূপে পরিচিত। লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির অন্যতম শাখা। লোকসংস্কৃতির পরিধি বিস্তৃত ও ব্যাপক। লোকসংস্কৃতি হল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পরম্পরাগত সৃষ্টি, যার মধ্যে গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। যার মধ্যে ঐ গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক পরিচয় ও মূল্যবোধ ধারাবাহিকতার সঙ্গে অনুভূতির মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। সামগ্রিকভাবে লোকসংস্কৃতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – ১) বস্তুগত লোকসংস্কৃতি ২) রূপায়ত লোকসংস্কৃতি। বস্তুগত লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল লোকশিল্প যেমন– মৃৎশিল্প, শোলশিল্প, শঙ্খশিল্প, বাঁশের কাজ বা শিল্প, দারু তক্ষণ শিল্প, সরাপট শিল্প প্রভৃতি। লোকশিল্প প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিবিদ তোফায়েল আহমেদ বলেছেন - "উন্নত সমাজের পরিমণ্ডলে অবস্থিত ভৌগোলিক অথবা সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার দরুণ কোনো জনগোষ্ঠী যখন সমসাময়িক ও পরিশীলিত চিত্রকলার ধারা বহির্ভূত স্বতন্ত্র স্টাইল বা রীতিতে গোষ্ঠীর প্রয়োজন ও রুচিমাফিক শিল্প সৃষ্টি করে তাকে লোকশিল্প বলা হয়।" সুতরাং বলা যেতে পারে যে, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাসকারী শৈল্পিক চেতনালব্ধ ঐতিহ্যময় মানবগোষ্ঠী, প্রাকৃতিক সহজলভ্য উপাদানের সাহায্যে প্রথাগতভাবে বংশ পরম্পরায় লোকায়ত সমাজভাবনার প্রতিবিম্বরূপে শাশ্বত যে শিল্পকর্ম করে তাই-ই 'লোকশিল্প'। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার লোকশিল্পের পাশাপাশি নদীয়া জেলার লোকশিল্প অতি প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত লোকশিল্প হিসাবে পরিচিত।

নদীয়া জেলার অবস্থানঃ নদীয়া জেলা (পূর্বনাম নবদ্বীপ জেলা) পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের একটি জেলা। নদীয়া জেলা একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল। ১৭৮৭ সালে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির জেলা হিসাবে নদীয়ার আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৮ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলা তার বর্তমান রূপটি লাভ করে। কর্কটক্রান্তি রেখা এই নদীয়া জেলাকে দুটি ভাগে ভাগ করে পূর্বদিকে মাজদিয়ার সামান্য উত্তর দিয়ে পশ্চিমে চাপড়া, নবীননগর, মধুপুর, কৃষ্ণনগরের উত্তরে ঘূর্ণি, আনন্দনগর, ভক্তনগর, বনগ্রাম, চৌগাছা, বাহাদুরপুরের উপর দিয়ে চলে গেছে। বর্তমান নদীয়া জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, উত্তর –পূর্বে কুষ্টিয়া জেলা, (বাংলাদেশ), দক্ষিণ ও দক্ষিণ – পূর্বে চব্বিশ পরগণা জেলা, পশ্চিমে হুগলি ও বর্ধমান জেলা অবস্থিত।

নদীয়া জেলার লোকশিল্পঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মত নদীয়া জেলার ঐতিহ্যময় ও গৌরবময় লোকশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, শোলা শিল্প, সরাপট শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, শঙ্খ শিল্প, দারু তক্ষণ শিল্প, কাঁসা – পিতল শিল্প, সূচী শিল্প, পাট শিল্প, নকশী কাঁথা শিল্প, প্রভৃতি হল অতি প্রাচীন লোকশিল্প। এই লোকশিল্পের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন - উপাদান, নির্মাণশৈলী, ব্যবহারিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন প্রভৃতি। নদীয়া জেলার

কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, ফুলিয়া, তাহেরপুর, চাকদহ, মুরাগাছা, নবদ্বীপ, রানাঘাট, মাজদিয়া, তেহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে লোকশিল্পের ধারা এখনো বজায় আছে।

মৃৎশিল্পঃ মৃৎশিল্প লোকশিল্পের একটি ব্যাপক ক্ষেত্র। কুম্ভকার নামে এক শ্রেনীর বৃত্তিজীবী লোকেরা গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার উপযোগী মাটির যাবতীয় হাঁড়ি, পাতিল, খেলার পুতুল, ও ঘর সাজাবার সৌখিন দ্রব্য তৈরি করে। বাঁশ, খড়কুটা, মাটি, কাপড় ও রং দ্বারা নির্মিত হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিগুলি অসাধারণ শিল্পকর্ম। নদীয়া জেলার লোকশিল্পের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প হল মৃৎশিল্প। মৃৎশিল্পের কথা আসলেই নদীয়ার যে স্থানটির নাম উঠে আসে সেটি হল কৃষ্ণনগরের তৈরী ঐতিহ্যবাহী পুতুল ও প্রতিমা শিল্পের কথা। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আরম্ভ হয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজার জন্য 'নরনারীর কুঞ্জর' গঠন থেকে। নয়টি নারী পুতুলের সমষ্টিতে গড়া হয়েছিল এই অদ্ভুত পুতুল। বিখ্যাত মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের পূর্বপুরুষ গোপাল পাল এর শ্রষ্ঠা। শোনা যায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে এই মৃৎশিল্পের সূচনা হয়। সেই সময় বাংলাদেশের নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীরা এসে মাটির পুতুল নির্মাণ করতে শুরু করেন। এরপরে আস্তে আস্তে এই সমস্ত মৃৎশিল্পীরা কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশের উত্তর – পুরুষেরা কৃষ্ণনগরে বারো মাসে তেরো পার্বণের ঐতিহ্যে নানা দেবীমূর্তি গঠন করতে শুরু করেন। ১৯৭১ সালে আনুমানিক ৩০০ জন কুম্ভকারদের নিয়ে কৃষ্ণনগর শহরের পূর্ব – দক্ষিণ প্রান্তে জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত ঘূর্ণিতে মৃৎশিল্পীদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। এছাড়াও কৃষ্ণনগরের ষষ্ঠীতলা, কুমোরপাড়া, নতুনবাজারে মৃৎশিল্পীদের বসবাস দেখতে পাওয়া যায়। মূলত বলা হয় জলঙ্গী নদীর তীরের মাটি সংগ্রহ করে এই সমস্ত মৃৎশিল্পীরা বছরের পর বছর ধরে তাদের হাতের সূক্ষ্ম কারুকার্য ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রেখেছেন যা কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলকে এনে দিয়েছে বিশ্বজোড়া সম্মান। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের জন্য আলাদা আলাদা তিনটি অঞ্চল বিভক্ত রয়েছে। প্রথম হল ঘূর্ণি সেখানকার শিল্পীর দক্ষতা প্রধানত পুতুল নির্মাণ এবং দেবদেবীর মূর্তি গঠন ও ভাস্কর্যের জন্য। দ্বিতীয়ত কুমোরপাড়া ও ষষ্ঠীতলা এই দুটি জায়গায় ছাঁচের ছোট ছোট পুতুল তৈরী করা হয়। আর সর্বশেষ যে জায়গার কথা বলা হয় সেটি হল রাজবাড়ির কাছাকাছি নতুন বাজার অঞ্চল। এরা প্রধানত মূর্তিশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তবে হাঁড়ি, কলসি গড়ার কুমোর সম্প্রদায়ের শিল্পীরা কৃষ্ণনগরের আশে পাশে বসবাস করেন।

বংশ পরম্পরায় প্রতিমা গড়ে বিখ্যাত ঘূর্ণি – কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীরা। কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের তৈরী বাস্তবমুখী শিল্প মুগ্ধ ছড়িয়েছে দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও। ১৮৫১ সালে লন্ডনে "এগজিবিশন অফ দি ওয়ার্কস অব ইন্দাসট্রিস অফ অল নেশনস" প্রদর্শনীতে ঘূর্ণির শিল্পী শ্রীরাম পালের, ১৮৬৭ সালে যদুনাথ পালের শিল্পকর্ম প্যারিসের " এক্সপজিশন ইউনিভার্সেল দ্য প্যারিস" প্রদর্শনীতে, ১৮৮৩ সালে চন্দ্রভূষণ পালের শিল্পকর্ম "এগজিবিশন ফরেন আর্ট ইন্ডাসট্রি" তে জার্মানির ইন্টার ন্যাশনাল কলনিয়াল প্রদর্শনীতে এবং ১৮৮৮ সালে "গ্লাসগো ইন্টার ন্যাশনাল এগজিবিশন" – এ যদুনাথ পাল, বক্রেশ্বর পাল, রাখাল দাস পালের শিল্পকর্ম স্থান পায়। বর্তমান প্রজন্ম এই কীর্তিকে আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন। খুব অল্প বয়সে রাষ্ট্রপতি

Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 30-36
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

পুরুস্কার পান সুবীর পাল, সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি পুরুস্কার পেয়েছেন তড়িৎ পাল। ১৯৪০ সালে শিল্পী কার্ত্তিক চন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে বসে কবির একটি মূর্তি তৈরী করে কবিকে মুগ্ধ করেছিলেন। কবিগুরু খুশি হয়ে তাঁকে শংসাপত্র দিয়েছিলেন। পুতুল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর প্রতিমা গড়ার ক্ষেত্রেও এখানকার শিল্পীদের বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের আভিজাত্য কাজের সূক্ষমতা এখানকার মাটির উপর নির্ভরশীল। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল তৈরী করা হয় ঘূর্ণির পাশে জলঙ্গী নদীর দোআঁশ মাটি দিয়ে। এই পুতুল তৈরির জন্য প্রথমে বেলে ও দোআঁশ মাটির মিশ্রণ তৈরি করে নেওয়া হয় তার সঙ্গে পরিমাণমত এঁটেল মাটিও মেশানো হয়। ছোট ছোট মূর্তির হাত পা গঠনের জন্য মাটির সঙ্গে তুলে দেওয়া হয়। মৃৎশিল্পের এই সূক্ষ্ম শৈলী কৃষ্ণনগর ব্যতীত কোনও জায়গায় লক্ষ্যনীয় নয়। ছাঁচের পুতুল ছাড়াও হাত দিয়ে তৈরি করা টিপিক্যাল বাস্তববাদী পুতুল গড়ার কৌশল একমাত্র কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এখানেই কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্য ও আভিজাত্য।

তাঁতশিল্পঃ নদীয়া জেলার অন্যান্য লোকশিল্পের মতো তাঁত বা বয়ন শিল্প একটি অন্যতম প্রাচীন লোকশিল্প। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বয়ন শিল্প বলতে শাড়ী একটি বৃহৎ স্থান অধিকার করে থাকলেও অন্যান্য উপাদান যেমন গামছা, লুঙ্গি, মশারি, ধূতি, কার্পেট প্রভৃতি ব্যবহারিক উপাদানগুলির চাহিদাও কিছু কম নয়। নদীয়া জেলার শাড়ির মধ্যে একদিকে যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় একই সঙ্গে এর পরম্পরাও এক বিশেষ রূপ প্রদান করে। তাঁতশিল্প লোকশিল্পের একটি ভাগ। এই তাঁতশিল্প বয়ন শিল্পের ঐতিহ্যবাহী শিল্প। তাঁতশিল্পের মৌলিক উপাদান তাঁত এবং সুতো। তাঁত প্রস্তুত হয় সহজলভ্য উপাদান যেমন বাঁশ, খুঁটি ও দড়ির দ্বারা, সুতো প্রস্তুত হয় বিভিন্ন গাছ থেকে প্রাপ্ত কার্পাস, শিমূল প্রভৃতি তুলো থেকে। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা তাঁতশিল্পের ঘরানায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই শিল্প বাংলার বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের বয়ন শিল্পের একটি অন্যতম নাম। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে আগত বহু তাঁতশিল্পীদের নদীয়া জেলাতে বসবাস শুরু হয়। নদীয়া জেলার শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, চাকদহ, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানে বহুল পরিমাণে তাঁতশিল্পের প্রচলন দেখা যায়।

স্বাধীনোত্তর সময় থেকেই নবদ্বীপে বয়ন শিল্পের শক্তিশালী প্রভাব ছিল। এখানকার শিল্পে বিশেষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য না থাকলেও এখানকার ধুতি, ওড়নার প্রভৃতির কদর ছিল বাজারে। এখানকার ধুতি ‘নদীয়া ধুতি’ নামে পরিচিত ছিল। এখানকার বস্ত্রশিল্প আরো শক্তিশালী হয় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আগত উদ্বাস্তদের দ্বারা। এঁরা মোটা সুতোর আটপৌরে কাপড় বয়নের সঙ্গে সঙ্গেই জামদানী ধরনের সূক্ষ্ম সুতোর বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন। এখানকার অধিকাংশ তাঁতে মোটা সুতোর আটপৌড়ে গামছা, লুঙ্গি, চাদর, শাড়ি প্রভৃতি বয়ন করা হয়। এখানে টাঙ্গাইল, জামদানী ও মাঠা তাঁতের কাপড় বয়ন করা হয়।

শান্তিপুরের শাড়ির শিল্পসৌন্দর্য সর্ব পরিচিত বিষয়। শান্তিপুরের সূত্রাগড়, বাইগাছিপাড়া, ঢাকাপাড়া, মালঞ্চপাড়া, কাজীপাড়া, তাঁতীপাড়া, সর্বানন্দীপাড়া, প্রভৃতি

Journal of Cultural Research Studies, Vol-1 Issue-1(2022), p. 30-36
A Peer-Reviewed International Multidisciplinary Online Journal.

স্থানে তাঁতশিল্প উৎপাদিত হয়। এখানে ৩০০ নং সুতো পর্যন্ত বয়ন করা হত। এখানকার শিল্পীরা সূক্ষ্ম নকশা বুননে দক্ষ। শ্রী অদ্বৈত আচার্যর (১৪৬০ – ১৫৫৮ সাল) জীবনীমূলক পুঁথি ‘অদ্বৈতমঙ্গলে’ শান্তিপুরের তাঁত হস্তশিল্পের কথা লেখা আছে। ‘অদ্বৈতমঙ্গলে’ শান্তিপুরের বৈষ্ণব তন্তুবায়দের সম্পর্কে জানা যায় –

“শান্তিপুরে যত ছিল তন্তুবায়

আচার্য প্রাঙ্গনে আসি হরি গুন গায়।”

১৪০৯ সালে গৌড়ের রাজা গণেশ দানু সাধন দেবের সময়ে শান্তিপুরে প্রথম শাড়ি বোনার সূচনা হয়। রাজা রুদ্র দেব রায়ের (১৬৮৩ – ১৬৯৪) সময় থেকে বানিজ্যিক ভাবে শাড়ি বোনার ঝোঁক বাড়তে থাকে। পরবর্তীকালে তাদের তৈরী শাড়ি শান্তিপুরী শাড়ি নামে পরিচিত হয়। মোঘল আমলেই সর্বপ্রথম শান্তিপুরের উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় সারা ভারত জুড়ে প্রসিদ্ধ লাভ করে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। শান্তিপুরের তাঁত নিয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও আগ্রহী ছিল। শান্তিপুরের তাঁতশিল্প সম্পর্কে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন-

শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি

নীলাম্বরী, উলঙ্গিনী, সর্বাঙ্গ সুন্দরী।

শান্তিপুরের শাড়ির বিশেষ আকর্ষণ হল পাড়ের নকশা এবং কারুকার্য। সেই নকশাগুলির মধ্যে বেশিরভাগই হল ফুল, জ্যামিতিক আকার, পৌরাণিক ঘটনাবলী, মন্দির ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায় এবং এই প্রত্যেকটি নকশার আলাদা আলাদা যেমন – নীলাম্বরী, গঙ্গা-যমুনা, ভোমরা, রাজমহল, চান্দমালা, আঁশপাড়, বৃন্দাবনী ময়ূর পাড় ইত্যাদি। জরির ব্যবহার এখানকার শাড়ির একটি বিশেষত্ব। এখানকার শাড়ির ভাঁজকে বলা হয় ‘গুটি ভাঁজ’।

শান্তিপুরের পাশেই ফুলিয়া জায়গাটি অবস্থিত। ফুলিয়াতে সূক্ষ্ম কারুকার্যময় নকশাদার টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন করা হয়। এখানকার টাঙ্গাইল শাড়ির ইতিহাস প্রাচীন। রামায়ণের পয়ার ছন্দ মিলিয়ে বলা হয়-

“কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন

টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন।”

ফুলিয়ার বুঁইচা, মাঠপাড়া, চটকাতলা, বাহান্নবিঘা, তালতলা, ইত্যাদি স্থানে তাঁতশিল্প বয়ন করা হয়। ফুলিয়া বিশেষরূপে খ্যাত তার টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য। টাঙ্গাইল স্থানের শিল্পীরা স্থানান্তরিত হয়ে এসে এখানে টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শুরু করেন বলেই পরম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত বয়ন লোকশিল্পের ঐতিহ্য এদের শিল্পকর্মেই ধরা পড়ে। ফুলিয়ার চটকাতলা বাসী তাঁতশিল্প ব্যবসায়ী বীরেন কুমার বসাক আজও ঐতিহ্য, পরম্পরা এবং আভিজাত্য বজায় রেখে হ্যান্ডলুমে প্রতিনিয়ত তাঁতের কাপড় বুনে চলেছেন। বীরেন কুমার বসাক

তাঁর তৈরী শাড়িতে রামায়ণের সপ্তকান্ড ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এই শাড়ির জন্য তিনি ২০০৯ সালে বস্ত্র মন্ত্রকের তরফ থেকে সেরা বস্ত্র শিল্পীর শিরোপা পেয়েছিলেন। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে তিনি পদ্মশ্রী পুরুস্কার পেয়েছেন।

সরাপটশিল্পঃ সরাশিল্প লোকশিল্পের প্রাচীনতম ভাগ। সরা মানে হল মাটির তৈরী একধরনের পাত্র বা ঢাকনা। সরার উপরিতলে যে ছবি আঁকা হয় তাকে বলে সরাচিত্র। সরাচিত্র রীতিগতভাবে লোকশিল্পের অন্তর্গত। সরাকে সমস্ত জায়গায় লক্ষ্মী বলা হয়ে থাকে। সরার উৎপত্তি মূলত বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলায়। নদীয়া জেলার অন্তর্গত তাহেরপুর নামে একটি গ্রামে প্রায় ১২-১৫ পরিবার মিলে তিন-চারটি প্রজন্ম ধরে সরাচিত্র আঁকেন। এখানকার সরায় যে দেবদেবীর ছবি আঁকা হয় সেগুলি হল দূর্গা–লক্ষ্মী, সরস্বতী-গনেশ-কার্ত্তিক, রাধা–কৃষ্ণ, কদমতলায় কৃষ্ণ-রাধা, লক্ষ্মী-নারায়ণ। নদীয়া জেলার তাহেরপুরের সরায় মূলত সাধারণত ফরিদপুর ও ঢাকাই সরার একটি মিশ্রিত শৈলীর মেলবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। বিষয়গত ভাবে দেখলে তাহেরপুরে ময়ূরপঙ্খী সরায় বসা লক্ষ্মী সরা দেখতে পাওয়া যায় না। তাহেরপুরের সরায় দুটি তল দেখা যায়। এখানে একপুতুল, তিনপুতুল, পাঁচপুতুল, রাধাকৃষ্ণ, দুর্গামূর্তি এই পাঁচ রকমের সরা ও হয়। এখানে ফরিদপুর বা সুরেশ্বরী সরা নতুনত্বের আদলে তৈরী করা হয়। এখানকার শিল্পীরা গণকা সরা বলে লাল রঙের সরা তৈরী করেন। এই গণকা সরা রাজপরিবারের সরা। রাজপরিবারে একসময় এই গণকা সরা পূজা করত। কিন্তু দিন দিন এই শিল্পের ঐতিহ্য কমে এলেও এই সরার কদর কিন্তু রাজ্যের বাইরেও আছে। নদীয়া জেলার তাহেরপুরের পর চাকদহের প্রত্যন্ত একগ্রাম তাতলা এবং তার পাশেই পুমলিয়া গ্রামে লক্ষ্মীর সরা তৈরী করা হয়। এইখানে মাটির তৈরী সরার সামনে অবতল ভাগে রং তুলি দিয়ে লক্ষ্মী মূর্তি আঁকা হয়। এটি ‘লক্ষ্মীর সরা’ নামে পরিচিত। নিম্নবৃত্তের হিন্দুরা এতেই লক্ষ্মী দেবীর পুজা দেয়। এমনকি এখনো এই রীতি প্রচলন আছে। এই ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

শোলাশিল্পঃ সনাতনের যেকোনো মাঙ্গলিক কর্মে এক অপরিহার্য প্রাকৃতিক বস্তু হল শোলা। পূজা উপাসনা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ণ ইত্যাদি সকল কাজেই শোলার প্রয়োজন হয়। শোলা একটি জলজ উদ্ভিদ। শোলার উৎস সন্ধান করলে জানা যায় যে সলিল থেকে শোলা কথাটির উদ্ভব হয়েছে। দেবদেবীর গহনা, মাথার মুকুট, মুকুটের খোল, চাঁদমালা, বিয়ের টোপর, মাথার টুপি, কদমফুল, গঙ্গা পূজায় ভাসানোর জন্য নৌকা ইত্যাদি নানা লোকশিল্প একত্রে হয়েছে শোলাশিল্প। এই শিল্পের মূল উপাদান হল শোলা। নদীয়া জেলার বটের বিলে একসময় প্রচুর শোলা জন্মাত। শোলার উপর চিত্র রচনা নদীয়া জেলার একটি উল্লেখযোগ্য চারুশিল্প। এখানে সাধারণত দু রকমের শোলা গাছ পাওয়া যায় – ফুল শোলা ও কাঠ শোলা। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর, কালীগঞ্জ, নবদ্বীপ, মতিয়ারি, শান্তিপুর, ও চাকদহের জগদীশপুরে এখনো শোলা লোকশিল্পের চর্চা বর্তমান। এখানকার মালাকারেরা শোলার টুপিও তৈরী করেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের নিকট প্রথম ডাকের সাজের সূত্রপাত হয় বীরনগরে। বীরনগরে যেসব শিল্পী ডাক এবং শোলার সাজ তৈরী করেন তাদের মধ্যে পালিতপাড়ার আচার্য শিল্পী নীলমণি আচার্য এবং কানাইলাল আচার্য। শোলাশিল্প নদীয়া জেলাতে এখনো লোকশিল্পের ধারা হিসেবে ঐতিহ্য মন্ডিত।

কাঁসা – পিতল শিল্পঃ কাঁসার থালা, গ্লাস, মগ, বাটি ইত্যাদির ব্যবহার দীর্ঘদিনের প্রাচীন। নদীয়ার নবদ্বীপ, মুড়াগাছা, ধর্মদা, রুকুনপুর এবং রাণাঘাট বহুদিন ধরে এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। শুধু থালা গ্লাস বাটি তৈরি করাই নয়, কাঁসা-পিতলের ফুলদানি থেকে শুরু করে গৃহসজ্জার নানা সামগ্রী আজও তৈরি করছেন এখানকার শিল্পীরা। এই গ্রামগুলির পাশাপাশি কালীগঞ্জের মাটিয়ারি গ্রামের শিল্পীরা বিশেষ করে কাঁসা-পিতলের পাত তৈরি করে তা থেকে প্রতিমা সহ অন্যান্য ঘর সাজানোর নানা সামগ্রী তৈরির বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। নবদ্বীপে পিতল দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি এবং বাসনপত্রও তৈরী করা হয়। কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসন, থালা, বাটি, গ্লাস, ফুলদানি নির্মাণে রাণাঘাটের শিল্পীরা এখনো পূর্ব পুরুষের জীবিকা টিকিয়ে রাখছেন। লোকশিল্পের এই ধারার শিল্পীদের কাঁসারু বলা হয়।

উপসংহারঃ বলাবাহুল্য নদীয়া জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হল এই লোকশিল্পগুলি। এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে বংশানুক্রমিকভাবে এর চর্চা আজও চলেছে। লোকশিল্পীর ব্যক্তিপ্রতিভা, সমষ্টিগত চেতনা, সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় এই শিল্পকর্মের মধ্যে।

তথ্যসূত্রঃ

1. আহমেদ, তোফায়েল. (১৯৯৯). ‘লোকশিল্প প্রসঙ্গে’, লোকসংস্কৃতি গবেষণা (বাঙলার লোকশিল্প বিশেষ সংখ্যা), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পৃঃ ১২।
2. বিশ্বাস, সুজিত. (২০০৯). তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা সমীক্ষা, ১৯৪০-২০০৭, অরুণা প্রকাশনা, কলকাতা, পৃঃ ৪।
3. পূর্বোক্ত তথ্য সূত্র নং ২, পৃঃ ৭।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

1. আহমেদ, তোফায়েল. (১৯৮৫). লোকশিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
2. আহমেদ, তোফায়েল. (১৯৯৪). লোকশিল্পের ভুবনে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
3. আহমেদ, তোফায়েল. (১৯৯৯). ‘লোকশিল্প প্রসঙ্গে’, লোকসংস্কৃতি গবেষণা (বাঙলার লোকশিল্প বিশেষ সংখ্যা), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ।
4. গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণ. (১৩৬৮). বাংলার লোকশিল্প, পুরোগামী প্রকাশনী, কলকাতা।
5. ঘোষ, প্রদ্যোত. (২০০৪). বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
6. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাঃ). (২০১১). লোকজ শিল্প, পারুল প্রকাশনী।
7. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার (সম্পাঃ). (২০০৪). বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ।
8. চক্রবর্তী, সুধীর. (১৯৮৫). কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প ও মৃৎশিল্পী সমাজ, কলকাতা।
9. দত্ত, গুরুসদয়. (২০০০). বাংলার লোকশিল্প ও লোকনৃত্য, ছাতিম বুকস, কলকাতা।
10. বিশ্বাস, সুজিত. (২০০৯). তাঁতশিল্পের বিবর্তনে নদীয়া জেলা সমীক্ষা, ১৯৪০-২০০৭, অরুণা প্রকাশনা, কলকাতা।
11. মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ. (১৪০৭). বাংলার লোকউৎসব ও লোকশিল্প, বঙ্গীয় – সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।
12. সাঁতরা, তারাপদ. (২০০০). পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।